ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০৪ ও ১০৫ (যুক্ত), সেপ্টেম্বর ২০২৪
ISSN : 2411-9059, e-ISSN: 3006-3078 DOI : http://dx.doi.org/10.62296/DVP/10405/010

# থিয়েটারে পোশাক পরিকল্পনায় বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা

ফাহমিদা সুলতানা তানজী*

**Abstract :** In a developing country like Bangladesh, garment related profession is very promising. The study focuses on costume planning in theater and its importance and potential in the context of Bangladesh. Basically, the current study focuses on the importance and potential of traditional costume planning in theater, based on the social reality of the whole world, developed under the shelter of moral responsibility. In the context of Bangladesh, what was meant by costume planning in theater in the past has changed drastically with the evolution of time and the expansion of academic education. Clothing is a type of clothing that clearly conveys people's class, gender, profession, morality, nationality, activities, etc. It is the medium of the non-verbal language of the human body. Theatrical costumes are objects designed based on the concept of actual costumes, which actors wear on stage. Through this, space-time, geographical condition, weather, gender, profession, morality etc. are reflected in the character. In today's changing society theater is not only changing but theater has to keep up with the world. And to face the challenges of this global world, if the theatrical costumes of Bangladesh can be connected with the traditions, the country's potential industrial entertainment sector will be exposed and at the same time efforts will be made to protect the native traditions which are also challenging. Memory, culture and heritage will be juxtaposed

* সহযোগী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ ও পিএইচডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

in the present essay on justification. Because both tradition and culture are creations of human mind. By both forms, actions, processes become more evident in society. In a less developed country like Bangladesh, the issue of theater clothing is so complex that navigating it is another goal of research. The essay's scholarly exploration of tradition and theater is determined to resist cultural hegemony and epistemological hegemony through opposition to authority and mastery, relying not on romanticism but on qualitative methods. The article will proceed through a structured abstract thinking process focusing on the knowledge of the subliminal or subliminal thoughts of the human mind by adopting semi-analytical methods, descriptive methods, historical methods, comparative methods, observational methods and case studies. As a result, there will be an attempt to prove that the human mind, accustomed to abstract thinking, moves towards the opposite binarism, by connecting the tradition of clothing, it can become one among many in a non-verbal process, and Bengali theater will be able to wander in the building of aesthetic art for a long time, freed from the burden of subjugation. And Bengali nation will get strong fear in the building of industry.

**মুখ্যশব্দ:** থিয়েটার, বাঙালি, পোশাক, ঐতিহ্যবাহী পোশাক, উন্নয়ন, সম্ভাবনা

## ভূমিকা

সভ্যতার পথে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ শিল্পচর্চা। শিল্প সৃষ্টির প্রয়াস এক সুদীর্ঘ সাধনার নান্দনিক রূপায়ণ। দীর্ঘ সময়ের ভাবনা, বেঁচে থাকার যাতনাকে সরলীকরণের প্রচেষ্টায় প্রাগৈতিহাসিক মানবসন্তান তার অনুভূতিকে অন্ধকার গুহায় বিবৃত করেছে রং রেখার নানাবিধ সরল বিন্যাসে। প্রত্নমানবের সীমিত উপকরণ নিজস্ব করণকৌশল বিশাল পরিধিতে বিবৃত হয়েছিল আশ্চর্য দক্ষতায়। তাদের এই শিল্প স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং স্বতঃস্ফূর্ত। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান তাদের শিখিয়েছে আটপৌরে জীবন ও শিল্পচর্চা একে অন্যের পরিপূরক। মূলত সৃষ্টিশীল ব্যক্তির দ্বারাই শিল্পের

সৃষ্টি হয়। শিল্পীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও ভাবনা হয়ে ওঠে শিল্পসৃষ্টির কাঁচামাল, যা নিরন্তর মূর্ত হয়ে ওঠে তার দেহের ও মনের ক্যানভাসে। শিল্পী যে অভিজ্ঞতা ও ভাবনাকে তার নিজস্ব বিচারে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন তাকেই সর্বোচ্চ দক্ষতার সাথে শৈলীতে, পছন্দসই মাধ্যমে প্রকাশযোগ্য করে তোলেন। আর এভাবে যে শিল্পের সৃজন হয় তা শিল্পরসিকের অনুভূতি, আচরণ, আবেগকে তাড়িত করার পাশাপাশি তার রসবোধকে পরিতৃপ্ত করে। শিল্পের এমনই একটি মাধ্যম হলো থিয়েটার। এই থিয়েটার কীরূপে বাঙালি জাতির সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে এবং থিয়েটারে পরিকল্পিত পোশাক কীরূপে দেশের সমাজ ও ওতপ্রোতভাবে সংস্কৃতিতে অবদান রাখতে পারে, প্রবন্ধে তাই বিশ্লেষণের প্রয়াস চালানো হবে। থিয়েটারে পোশাক পরিকল্পনা আক্ষরিকভাবে নাটকে চরিত্রের প্রয়োজনে পোশাকের নকশা-প্রণয়নের পদ্ধতিকে বোঝায় এবং এর মাধ্যমে অবশ্যই পরিকল্পকের উদ্দেশ্য থাকে মঞ্চ, সহঅভিনেতা ও দর্শকের সাথে যোগাযোগ স্থাপন। পোশাক দর্শকের সাথে যোগাযোগের অবাচনিক যোগাযোগের মাধ্যেম, যার মাধ্যমে বার্তা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, সাঈদ আহমদের (১৯৩১-২০১০) *মাইল পোস্ট* নাটকে চৌকিদারের সংলাপ থেকে জানা যায়, "দুর্ভিক্ষ ঘাসের কচি শিসটি পর্যন্ত নিঃশেষ করেছে" (হাসনাত, ২০১২, পৃ. ৩৮)। এখানে চৌকিদার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি করে। তুমি কে? (হাসনাত, ২০১২, পৃ.৩৭)। পরিচয়ের গোলক ধাঁধায় গোরখোদক যেন আলবেয়ার কামুকে ( ১৯১৩-১৯৬০) অনুসরণ করে বলে, "কী আশ্চর্য প্রশ্ন! পোশাক দেখে বুঝতে পারছো না ও একজন ডাকপিয়ন" (হাসনাত, ২০১২, পৃ.৩৭)। অর্থাৎ পোশাক হলো মানুষের ব্যবহার্য এমন বিষয় যা ভৌগোলিক অবস্থান, ধর্ম, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতিকে তুলে ধরার স্বার্থে ব্যক্তি কিংবা জাতিতাত্ত্বিক পরিচয় তুলে ধরে। থিয়েটার যেহেতু জীবনের কথা বলে তাই নাটকের জন্য পরিকল্পিত পোশাক এর ব্যতিক্রম নয়। এখানে চরিত্রগুলো গল্পকে উপস্থাপনের স্বার্থে পরিকল্পিত পোশাক পরিধান করে থাকে। সুপরিকল্পিত পোশাক পরিকল্পনা মঞ্চে অভিনেতাদের অভিনয়ের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যেহেতু এটি দৃশ্যকাব্য তাই একজন পোশাক পরিকল্পকের দায়িত্ব অনেক। সহজ কথায় বলতে গেলে, থিয়েটারে পোশাক হলো তাই, যা অভিনেতারা অভিনয়ের সময়ে ব্যবহার করে। মঞ্চে একটি সুপরিকল্পিত পোশাকের মাধ্যমে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। সমগ্র বিষয়টি সংকেতের মতো কাজ করে রং, রেখা, আকার, গঠন প্রভৃতির মাধ্যমে। যেহেতু গবেষণাটি বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে থিয়েটারের ঐতিহ্যবাহী পোশাক সংক্রান্ত জ্ঞান উৎপাদনকে ঘিরে তাই ঐতিহ্য কথাটি প্রবন্ধে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। মূলত, ঐতিহ্য হচ্ছে তাই, যা যুগ যুগ ধরে কোনো জনগোষ্ঠীর মাঝে টিকে থাকে। মানুষের অভ্যাস, আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা এর অন্তর্ভুক্ত। ঐতিহ্যের সাথে

ইতিহাস শব্দটি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। আর পোশাক শব্দটি বাঙালি জনগোষ্ঠীর উত্তরাধিকারসূত্র থেকে প্রাপ্ত, যার ব্যাপ্তি আদিম মানব সমাজের স্যাভেজ অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। মানব সভ্যতার ইতিহাসে পোশাকের আবিষ্কার নিঃসন্দেহে এক অনন্য কৃতিত্ব। আদিম গুহাবাসী মানুষ যখন বুঝতে শিখেছে নিজেদের লজ্জা নিবারণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে, ধরে নেয়া যায় সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল প্রয়োজনীয়তা বাস্তবায়নের। আজকের সভ্য মানুষ আর সেই আদিম মানুষের মাঝে আকাশ পাতাল পার্থক্য সৃষ্টি করেছে পোশাক। আমাদের মৌলিক চাহিদার দ্বিতীয় চাহিদাই হলো পোশাক। যদি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় ঠিক কবে থেকে মানব জাতি পোশাকের ব্যবহার শুরু করেছে বা কে আবিষ্কার করেছিল পোশাক, তবে এ প্রশ্নের উত্তর উদঘাটন হবে খুবই কষ্টসাধ্য। আদিম মানুষ সাধারণত পরিবেশের প্রভাব– যেমন শীত বা উষ্ণতা থেকে নিজেদের রক্ষার নিমিত্তে গাছের বাকল বা পশুর চামড়া পরিধান করত। কিন্তু এ ধরনের বস্তু খুব সহজে পঁচে যায় বিধায় এসব বস্তুর কোনো ফসিল বা নমুনা পাওয়া যায়নি অদ্যবধি। যার কারণে বলা মুশকিল যে কবে থেকে মানুষ পোশাক পরিধান শুরু করেছিল। তবে এ সম্পর্কিত যে দু-একটি নমুনা পাওয়া যায় সেটাও ঠিক কিনা এ সম্পর্কে গবেষকরা উপযুক্ত কোনো মতামত প্রদান করতে পারেনি। তবে প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণার ওপর ভিত্তি করে এ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি প্রমাণ পাওয়া গেছে। গবেষকগণের গবেষণার উপর নির্ভর করে জানা যায় যে, প্রায় এক মিলিয়ন বছর পূর্বে মানুষ যখন তার শরীরের অপ্রয়োজনীয় লোম হারাতে শুরু করে, সে সময় থেকেই মূলত শুরু হয় পোশাক পরিধান। অর্থাৎ ঐতিহ্যগত বিচারে ধারণা করা হয় হোমো হাবেলিস অর্থাৎ হাতের কাজে পটু মানুষ লজ্জা কিংবা বিরূপ প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে বাঁচার জন্য নানা উপাদানের ব্যবহার শুরু করে। বর্তমান পোশাক আজ আদিম মানুষের চিন্তার কাঠামোর সাথে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বর্তমান পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। প্রবন্ধে স্যাভেজ মানুষের উদ্ভাবনকে খারিজ না করে বর্তমান জ্ঞানচর্চার তাৎপর্যকে ক্ষমতা ও ইতিহাসের সংযুক্তিপূর্বক প্রমাণের প্রয়াস থাকবে যে, প্রতিটি দেশের আদিম নাগরিকেরা বংশ পরম্পরায় যে রীতির পোশাক উদ্ভাবন করেছে, তা জ্ঞানের আলোয় বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। স্মর্তব্য, প্রতিটি জনপদের পোশাক সে দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া, অধিবাসীদের পেশা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে উদ্ভাবিত হয়েছে। আধুনিক বয়ানে যাকে বলা যায়, ইকো ফ্রেন্ডলি পোশাক। আর এই পোশাক বাস্তবিক জীবন তো বটে, থিয়েটারে যদি ব্যবহার করা হয় তবে তা ঐতিহ্যের পাশাপাশি দেশীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে সক্ষম।

**অধ্যয়নের পটভূমি**

প্রায় ১৭ কোটির অধিক জনবহুল এদেশ বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য সুন্দরবন ও দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত নিয়ে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। জাতিগতভাবে এদেশের অধিকাংশ মানুষকে বাঙালি বলে অভিহিত করা হয়। পৃথিবীতে বাসরত অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর মতো এই বাঙালি বিবর্তনের জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসেছে। যেহেতু অস্ট্রোলোপিথেকাস নরবানরসমূহ ভারতবর্ষে পরিলক্ষিত হয়নি কিন্তু তার আগে ও পরে মানুষ এই অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়েছে তাই বলা যায়, যখন থেকে পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠেছে তখন থেকে সে তার অস্তিত্বের প্রমাণ এই অঞ্চলে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ভারত অতীতে আফ্রিকা মহাদেশের অংশ ছিল। ধারণা করা হয়, এই অঞ্চলে বাসরত নরবানরেরা জন্ম দিয়ে থাকবে "আধুনিক মানুষের মতো অত্যাশ্চর্য প্রাণী" (শরবিন্দু, ২০২২, পৃ. ৪৪ )। বাঙালি জাতি দক্ষিণ এশিয়ার বিশেষ একটি ইন্দো-আর্য জাতিগোষ্ঠীর নাম। ধারণা করা হয়, নেগ্রিটো জাতি থেকে বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে। এই জনগোষ্ঠীর ভেতর রয়েছে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের ১২টি জাতিগোষ্ঠী, মালয়শিয়া ও থাইল্যান্ডের ৬টি সেমাং জাতিগোষ্ঠী এবং ফিলিপাইনের ৩০টি জাতিগোষ্ঠী। আদিম মানব প্রজাতির একটা অংশ বিভিন্ন স্থান ঘুরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রবেশ করেছিল অপর একটি দল ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ২০০৮ সালে ভারতের *The Telegraph,* March, 2008 সংখ্যার একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, প্রাক-ঐতিহাসিক বঙ্গদেশে মানুষের পদচারণা শুরু হয়েছিল প্রায় ২০,০০০ বৎসর আগে। প্রবন্ধে, এই বঙ্গদেশ যে আল যোগে বা অন্য কোনো কারণে কালক্রমে বাংলা নাম ধারণ করেছে, সেই স্থানের অধিবাসীদের পোশাক সম্বন্ধীয় বিষয়ে আলোকপাত করা হবে এবং প্রমাণের প্রয়াস থাকবে যে, বাঙালির পোশাক শৈলী বর্তমান সময়ের আবিষ্কার নয় এবং এদেশের থিয়েটারগুলো দেশীয় শিল্প চেতনায় উদ্ভুত হয়ে নকশা প্রণয়ন করলে দেশীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

**গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

সসীম এই জগতে বাউন্ডারিবিহীন পৃথিবীতে জ্ঞানের অবস্থান অস্থিতিশীল। এটা আধুনিক বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক বয়ান। প্রশ্ন উত্থাপন স্বাভাবিক পৃথিবী সসীম হলে থিয়েটারে এর জ্ঞান চর্চার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে। যেহেতু থিয়েটার আজকের ও একইসাথে ভবিষ্যতের, সেহেতু সে সসীম জ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে সক্ষম। অর্থাৎ গবেষণার সূত্রপাত পোশাকের বাস্তবিকতা

ও জ্ঞানকে ঘিরে। পৃথিবীর নানা প্রান্তে নানা শৈলীর থিয়েটার পরিবেশিত হয় ও এতে নানা শৈলীর পোশাক পরিকল্পনা করা হয়। কোন সময়ে কোন শ্রেণির বা শৈলীর থিয়েটার পরিবেশিত হয়েছে তা প্রবন্ধের বিচার্য না হলেও উত্তরাধুনিক সময়ে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের পোশাক সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং থিয়েটারের বাস্তবিকতায় জ্ঞান চর্চা আবশ্যক কিনা এই সংক্রান্ত প্রশ্ন থেকে যায়। এই জ্ঞানের বিষয়টাই প্রবন্ধের অ্যাপিস্টোমলজি। আর এই জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট পদ্ধতিকে অবলম্বন করে গবেষণা কার্যক্রমটি এগিয়ে যাবে। স্মর্তব্য, থিয়েটার একইসাথে আনন্দদান ও শিক্ষাদান এই দুই মহান দায়িত্বে নিয়োজিত। তাই তাকে নির্দিষ্ট ভাষা বলয়ের মাঝে বিচরণ করতে হয়। পোশাক মৌখিক উপায়ে কথা না বললেও সাংকেতিক উপায়ে কথা বলে। কোনো চরিত্রকে যথেচ্ছ পোশাক পরিধান করানো পোশাক পরিকল্পকের কাজ নয়। সমগ্র কাজটি তিনি করেন অবাচনিক উপায়ে, যেখানে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব সঠিক উপায়ে প্রস্ফুটিত হয়। কিছু পরিকল্পক তাদের সমগ্র পরিকল্পনা ছয়টি ভাগে বিভক্ত করে থাকেন। এগুলো হলো– সমস্যা চিহ্নায়ন, প্রাথমিক কল্পনা, নকশা পরিমার্জন, নকশার আদিরূপের উন্নয়ন, মূল্যায়ন এবং বাস্তবায়ন। তবে পারসনস ও ক্যাম্পবেল পারসনস ও ক্যাম্পবেল (Parsons and Campbell, 2004) পরিকল্পনার প্রক্রিয়াকে চার ভাগে ভাগ করেছেন, সমস্যা চিহ্নায়ন, ধারণাগত নকশা, নকশার আদিরূপের উন্নয়ন, সমস্যার সমাধান। সংক্ষেপে পোশাক পরিকল্পনা প্রক্রিয়া শুরু হয় সমস্যা চিহ্নায়ন থেকে, যেখানে নানা উপাত্তের সঞ্চয় করা হয় এবং তথ্য ও উপাত্তের গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণ করা হয় এবং সমাধানের প্রয়াস চালানো হয়। একজন পরিকল্পক সমগ্র তথ্যের সমন্বয় ঘটান ও ধারণা তৈরি করেন। পরিশেষে পরিকল্পিত নকশার গঠন ও মূল্যায়নের পর তা মঞ্চায়নের জন্য পরিকল্পিত পোশাকটি প্রদর্শনের জন্য নির্বাচিত হয়। পোশাক পরিকল্পনার সামগ্রিক বিষয়গুলো তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণপূর্বক বাংলাদেশের থিয়েটারে এর প্রয়োগকে বেগবান করার লক্ষ্যে প্রবন্ধের যাত্রা।

**গবেষণার প্রশ্নমালা**

১. বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের পোশাক পরিকল্পকগণ কীরূপে পরিকল্পনার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ তৈরি করতে পারবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে ?
২. কীভাবে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বাংলাদেশের পোশাক পরিকল্পকগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াসমূহের মাধ্যমে ধারণা ও সৃজনশীলতার প্রক্রিয়াশ্রিত হয় ?

৩. পোশাক পরিকল্পকগণের ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা ও সিদ্ধান্ত কীভাবে প্রভাব রাখে ?
৪. বাংলাদেশি পোশাক পরিকল্পকের পরিকল্পনা প্রক্রিয়া কি শৈল্পিক পোশাক পরিকল্পনার জন্য সহায়ক?

## সাহিত্য পর্যালোচনা

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের তাত্ত্বিকগণ পোশাক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করলেও বর্তমান পর্যন্ত সর্বমোট কতোটি কাজ হয়েছে তা সংখ্যায় উল্লেখ করা কষ্টসাধ্য কাজ। কারণ অনেক লেখার তথ্য সংখ্যায় নথিভুক্ত হয় না। তবে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন একাডেমিক জার্নাল, বুক চ্যাপ্টার, কনফারেন্স পেপার, ডিজার্টেশন ও থিসিসে গবেষণামূলক কাজ হয়েছে। আন্তর্জাতিক জার্নালগুলোতে পোশাক নিয়ে প্রচুর গবেষণাধর্মী কাজ হচ্ছে। সেখান থেকেই মূলত রলাঁ বার্থের পোশাক পরিকল্পনায় সেমিওটিক সিস্টেমের কথা ও স্যার আইজ্যাক নিউটনের রঙের তত্ত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়, যা বর্তমানে পোশাক গবেষণার ভিত্তিমূল। বাঙালির পোশাক সংক্রান্ত বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়, বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য সংবলিত বইতে। এছাড়াও ঐতিহাসিক নাটক, পৌরাণিক নাটক, সামাজিক নাটক, ইতিহাস, ভ্রমণবৃত্তান্ত, দলিল দস্তাবেজ, পুরাকীর্তি প্রভৃতির ওপর আশ্রয় করে গবেষকগণকে নাটকে বর্ণিত পোশাকের বাস্তবিকতা নির্ণয় করতে হয়। ভৌগোলিক কারণে এদেশের আবহাওয়া আর্দ্র হওয়াতে পুরাতন নথি এদেশে পাওয়া দুষ্কর। প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে বর্তমানে অতীতের সমস্যা থেকে গবেষকগণ অনেকটাই মুক্ত। সবদিক বিবেচনায়, প্রাচীন বাঙালির পোশাক নিয়ে নির্ভরযোগ্য গবেষণা বেশ কষ্টসাধ্য কাজ, তবে অসাধ্য নয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, তত্ত্বের আলোকে পোশাক সংক্রান্ত জ্ঞানের শূন্যতা থেকে প্রবন্ধের যাত্রা।

চিত্র : ১
(১৮৮০-র দশকে নারীর পোশাক ও সাজ-সজ্জা)

**অধ্যয়ন পদ্ধতি**

বর্তমান গবেষণাটি সুনির্দিষ্টভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে গুণগত পদ্ধতিকে উপজীব্য করে এগিয়ে যাওয়া হবে। মূলত, পোশাক পরিকল্পনার তাত্ত্বিক কাঠামো ও থিয়েটারের ভাষা সমগ্র পৃথিবীর সমাজ বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে নৈতিক দায়বদ্ধতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। যেহেতু থিয়েটার আজকের ও ভবিষ্যৎকালের তাই, সামাজিক নিয়ম-নীতিকে অভিনেতাদের মাধ্যমে দর্শকের কাছে পৌছানো নাট্যকার ও নির্দেশকের কর্তব্য। গবেষণার কার্যক্রমটি এগিয়ে নিয়ে যেতে থিয়েটারে ভাষার শুদ্ধতা ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণপূর্বক সুশৃঙ্খল পদ্ধতি অনুসরণ করে জানা উপাত্তকে ব্যবহার করে তথ্য ও সত্যকে তুলে ধরা গবেষণার লক্ষ্য। আর এক্ষেত্রে মাধ্যমিক তথ্য, উপাত্তের নিয়মতান্ত্রিক বিশ্লেষণ করা হবে। "বস্তুত, গবেষণায় প্রাপ্ত ফল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানের শূন্যতা পূরণ করে" (সফিকুন্নবী, সাইফুজ্জামন এবং হাসান, ২০১৭, পৃ. ১৫)। স্মর্তব্য যে, Drama in performance before an audience, is a complex historical utterance (Dans, 2007, p. 268)। গবেষণা কার্যক্রমটি আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি, বর্ণনামূলক পদ্ধতি, ঐতিহাসিক পদ্ধতি, তুলনামূলক পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ও কেস স্টাডিকে কেন্দ্র করে এগিয়ে যাবে। অর্থাৎ সমগ্র গবেষণা কার্যক্রমটি মিশ্র পদ্ধতিকে অবলম্বন করে এগিয়ে যাবে।

**গবেষণা নকশা পদ্ধতি**

পোশাক আধুনিক জীবনের একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ। পোশাক ছাড়া সভ্য সমাজ কল্পনাই করা যায় না। পোশাকের শাব্দিক অর্থ করলে দাঁড়ায় বস্ত্র, বস্ত্রণ, জামা-কাপড় প্রভৃতি। সুতরাং পোশাক হলো এমন এক ধরনের পরিধানের রীতি যার ফলে কোনো এক শ্রেণির মানুষের শ্রেণি, লিঙ্গ, পেশা, নৈতিকতা, জাতীয়তা, কার্যক্রম প্রভৃতি সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায়। আর থিয়েট্রিক্যাল পোশাক হলো এমন এক ধরনের পোশাক, যা অভিনেতারা মঞ্চে পরিধান করে অভিনয় করে থাকেন। এর মাধ্যমে চরিত্রে স্থান কাল, ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া, লিঙ্গ, পেশা, নৈতিকতা প্রভৃতির প্রতিফলন ঘটে। গবেষণাটি যেহেতু থিয়েটারের ভাষা, চিন্তা ও এর তাত্ত্বিক কাঠামোকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত তাই প্রথমত, সুইস ভাষাতাত্ত্বিক ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর (১৮৫৭-১৯১৩ ) এর ভাষাতত্ত্ব বিশ্লেষণ হওয়া জরুরি। এই তত্ত্বমতে, প্রতিটা ব্যক্তির মস্তিষ্কে ভাষাগত সিস্টেম অভিজ্ঞতা থেকে নির্মিত হয়। ভাষা হচ্ছে ভাব প্রকাশের মাধ্যম। সোস্যুর এই

জায়গায় আলোকপাত করার প্রয়াস চালিয়েছেন, তিনি আরেক স্থানে দৃষ্টিপাত করেছেন, তা হলো ভাষার উদ্ভব সম্পর্কিত বিষয়। অর্থ্যাৎ প্রথমে মানুষ ছিলো, তারপর ভাষা সৃষ্টি হয়েছে। এটি অবশ্যই তাঁর প্রাথমিক ডিপার্চার। তাঁর মতে ভাব ও ভাষা আলাদা নয়। একটি নষ্ট হলে অন্যটিও হবে। মানুষ আদতে ভাষার নিয়মের মধ্যে বেড়ে ওঠে, অন্যদিকে ফ্রয়েড বলেছেন আনকনশাস-এর কথা। সোস্যুর মূলত ভাষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করেছেন। উত্তর-আধুনিক এই সময়ে দর্শক এভাবেই তার ক্ষমতার ব্যবহার করে। স্টুয়ার্ট হল-এর রেপ্রিজেন্টেশন তত্ত্বও গবেষণার জন্য অত্যন্ত জরুরি। তত্ত্বটিতে ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধারণার অর্থ নির্মাণ করা সম্ভব তা বলা হয়েছে। এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া সন্দেহ নাই। এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রযোজক যা চান তা তিনি এনকোড করে উপস্থাপন করেন, পরে দর্শক তা ডিকোড করে। যেকোনো রেপ্রিজেন্টেশন তাই সাংস্কৃতিক। রেপ্রিজেন্টেশন অর্থ ও ভাষাকে সংস্কৃতির সাথে যুক্ত করে। একই সংস্কৃতিতে যারা বসবাস করে তাদের অবশ্যই বৃহদার্থে, একই ধারণাগত মানচিত্র বিনিময় করতে হয়। অনুরূপভাবে তাদের অবশ্যই ভাষার চিহ্নসমূহ ব্যাখ্যার কায়দাটিও একইভাবে গড়ে তুলতে হয়। এভাবেই মানুষের মাঝে কার্যকরভাবে অর্থ বিনিময় ঘটতে পারে। প্রতিনিয়ত মানুষ দৃশ্যগত ইমেজের সম্মুখীন হয়। স্মর্তব্য, মিডিয়াতে প্রক্ষেপিত ইমেজ বেশিরভাগই দ্বি-মাত্রিক, আর বাস্তব ইমেজ ত্রিমাত্রিক। দৃশ্যগত চিহ্ন বা ইমেজ, সে যা বোঝাতে চায় তার সাথে অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ হবার পরও এর ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। এক্ষেত্রে কথা/সংলাপ আরও জটিলতার সৃষ্টি করে। কারণ শব্দ বস্তুর মতো দেখা যায় না। এই তত্ত্বের স্বেচ্ছাকৃত মনোভঙ্গি অনুযায়ী, বক্তা ভাষার মাধ্যমে বিশ্বের সবকিছুর ওপর নিজস্ব কর্তৃত্বারোপ করে। কারণ প্রত্যেক মানুষই তার নিজের মতো করে পৃথিবীকে দেখে এবং ভাষার মাধ্যমেই যোগাযোগ স্থাপন করে। তত্ত্বের তৃতীয় মনোভঙ্গী অনুযায়ী, বস্তুটি নিজে অথবা ভাষা ব্যবহারকারী যে কেউ ভাষার অর্থ স্থির করতে পারে। তত্ত্বটি সোস্যুরীয় তত্ত্বের উত্তরসূরি।

ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুরের তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত রোনাল্ড বার্থেস পোশাক পরিকল্পনায় সেমিওটিক সিস্টেমের কথা বলেছেন। তিনি পোশাকের আক্ষরিক অর্থ উদ্‌ঘাটনের জন্য এই পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। এর মাধ্যমে নাটকের চরিত্রগুলো অবাচনিক উপায়ে দর্শকের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ পোশাক দেখে দর্শক চরিত্রের বয়স, পেশা, ভৌগোলিক অবস্থান, লিঙ্গ প্রভৃতি অনুধাবনে সক্ষম হয়। জ্যাকবসন এর ধারণা অনুযায়ী, পোশাক শরীর ও মনো-সামাজিক সংযোগের মাধ্যমে দর্শককে বার্তা পাঠায়। দর্শক তা ডিকোডের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটন করে।

নাটকে পোশাক পরিকল্পনায় রং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পোশাক পরিকল্পনায় কেবল নকশা প্রণয়ন করলেই হয় না, এর সাথে নান্দনিকতা ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হয়। এরিস্টটল (খ্রি .পূ. ৩৮৪- খ্রি .পূ.৩২২) এর মতে গাঢ় লাল রং সূর্যের আলো বা আগুনের আলোর সাথে কালো রঙের মিশ্রণের ফলে উৎপন্ন হয়। পরবর্তীকালে নিউটন রঙের তত্ত্ব নির্মাণ করেন। তিনি একটি প্রিজমের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করেন। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী প্রাথমিক রং হলো লাল, হলুদ ও নীল।

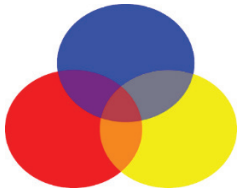

**চার্ট: ২**

উল্লেখ্য, রঙের মাধ্যমে মানব মনের সাথে রঙের সম্পর্ক স্থাপিত হয়, যা মনস্তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত। কালার হুইলে বর্ণিত যৌক্তিক রঙের বিন্যাস পরিকল্পকের নকশায় একতা, অনুপাত প্রভৃতির সমন্বয় করে।

**চার্ট: ৩**

বর্তমান গবেষণাটি সামগ্রিক বিচারে মূলত তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে এগিয়ে যাবে।

## বাঙালির পোশাক

প্রাচীন গুহাবাসী মানুষ থেকে আধুনিক মানুষ প্রত্যেকের সাথে পোশাকের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মূলত যেকোনো দেশের পোশাক নির্বাচিত হয় সেদেশের আবহাওয়া ও সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে। উদাহরণস্বরূপ, মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ লম্বা পোশাক পরিধানের কারণ সেদেশের উষ্ণ আবহাওয়া। সময়ের পরিক্রমায় পোশাক নির্বাচনে যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, অর্থনীতি ও

সৌন্দর্যবোধ। বাঙালির পোশাকের ক্ষেত্রেও এই বিষয়টির ব্যতিক্রম নয়। বিভিন্ন প্রমাণাদির মাধ্যমে জানা গেছে, আদি বাঙালির পোশাকের সাথে বর্তমান বাঙালির পোশাকের রয়েছে বিস্তর ফারাক, আবার কিছু ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতাও পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ বাইনারি অপজিশন বাঙালির পোশাকের অংশ। বাঙালির পোশাকে কখনও শাসকের প্রভাব লক্ষ করা যায়, আবার কখনওবা ধর্মের প্রভাব। বাংলা সাহিত্যের যে আদি নিদর্শন চর্যাপদ, তাতে বাঙালির পোশাক সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। তবে প্রচীন ও মধ্যযুগের যেসব ভাস্কর্য, পোড়ামাটির ফলক প্রভৃতি পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, পোশাকের উদ্দেশ্য ছিল বৈরী আবহাওয়া থেকে রক্ষা ও লজ্জা নিবারণ। স্মর্তব্য সেই সময়ে নারী পুরুষের পোশাকের পার্থক্য খুব একটা থাকত না, এখানেও লৈঙ্গিক বাইনারির প্রভাব সুস্পষ্ট। অর্থাৎ পোশাকের মাধ্যমে লিঙ্গ বিচারের বিষয়টি তৎকালীন সময়ে ছিল গৌণ। মুসলমান শাসকেরা যখন এদেশ শাসন করতে এসেছিল, তারা তাদের রুক্ষ অঞ্চলের পোশাকের পরিবর্তন করেনি। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে এদেশের মানুষ তাদের পোশাক গ্রহণ করা শুরু করে ধর্মকে উপজীব্য করে। মুসলমানি এই পোশাকের রীতি অন্য ধর্মের মানুষদেরও গ্রহণ করতে দেখা যায়, যদিও পরিধানের রীতিতে ছিল বৈচিত্র্য। তবে যাদের নতুন রীতির পোশাক কেনার সামর্থ্য ছিল না তারা আগের মতো ধুতি পরিধান করত। ষোল শতকের শেষের দিকে মুসলমানেরা ইজার বা পায়জামা নামক পোশাকটি গ্রহণ করে। তবে সাধারণ মুসলমান, অর্থাৎ খেটে খাওয়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এটি ব্যবহার করত না। মুসলমানদের অনেকে ধুতির চেয়ে খাটো একখণ্ড পোশাক পরত, যাকে বর্তমানে লুঙ্গি বলে। এতো কিছুর মাঝেও জুতা পড়ার রীতির তথ্য পাওয়া যায়নি। ইংরেজরা এদেশে তাদের শাসন ও বসতি পাকাপোক্ত করার পর থেকে বাঙালির পোশাকে তাদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তবে মোঘলদের পোশাকের মতো ইংরেজদের পোশাকও রাতারাতি বাঙালির সংস্কৃতিতে জায়গা করে নেয়নি। নবাবি আমলের পোশাক ইংরেজ আমলে অক্ষুণ্ন থাকলেও দেখা যায়, এরসাথে যুক্ত হয়েছে চেইন আর ঘড়ি। হুতুম প্যাচার নকশায় পূজা দেখতে যাওয়া মানুষের পোশাকের বর্ণনায় প্যালানাথবাবু লিখেছেন, কোঁচানো ধুতি, ধোপদুরস্ত কামিজ, শান্তিপুরী উড়ুনি ও নেটের চাদর পরিধানের কথা। শার্ট বাঙালি সমাজে জনপ্রিয়তা পেলেও বিশ শতকের আগে সর্বস্তরে এর ব্যবহার লক্ষ করা যায় না। বাঙালি সমাজে আরেকটি জনপ্রিয় পোশাক ছিল গলা বন্ধ কোট। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সেকালের অভিজাত বাঙালি পুরুষদের ফ্যাশনে এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তবে অভিজাতদের পোশাকে ব্রিটিশদের ফ্যাশনের প্রভাব লক্ষ করা গেলেও সাধারণ হিন্দু মুসলমান সর্বস্তরের মানুষ ধুতি পরিধান করতো। কাজী মোতাহার হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখদের ধুতি ব্যবহারের কথা জানা যায়। পরবর্তীকালে ধুতিকে কট্টরপন্থিরা হিন্দুয়ানি পোশাক

বলে অভিহিত করে। বিশ শতকের দিকে বাঙালি মুসলমানকে ধুতির বদলে লুঙ্গি ব্যবহার করতে দেখা যায় ও দেশভাগের ফলে ধুতি বাংলাদেশে ক্রমশ লোপ পায়। অর্থাৎ পোশাকের সাথে ইতিহাস ও ধর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। প্রাচীন বাংলায় সেলাই করা কাপড়কে অপবিত্র বলে ভাবা হতো। পোশাক পরিবর্তনের যে ধারাবাহিকতা এ পর্যন্ত বিবৃত হয়েছে তা পুরুষদের মাঝেই পরিলক্ষিত হয়। নারীর পোশাক ছিলো মূলত শাড়ি। শাড়ি নিয়ে জানার প্রথমে দরকার এই শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে। শাড়ী শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'শাটি' থেকে, যার অর্থ এক ফালি কাপড়। পরবর্তীকালে এটি বিবর্তনের পথ ধরে বর্তমান ফ্যাশনের রূপ ধারণ করেছে এবং এটি আজও তার মূল বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ন রেখে প্রচলিত আছে। এর উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে হলে খ্রিষ্টপূর্ব ২৮০০-১৮০০ সময়ে যেতে হবে। ভারতবর্ষীয় উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের সিন্ধু সভ্যতার প্রচলন খুঁজে পাওয়া গেছে। সিন্ধু সভ্যতার পুরোহিতদের শাড়িকেই ধুতির মতো করে পরিহিত অবস্থায় দেখা যায় এবং মনে করা হয় ধুতিই শাড়ি প্রচলনের ভিত্তি। নারী ও পুরুষ উভয়ই পরতেন একটি মাত্র বস্ত্র; যার নাম শাড়ি অথবা ধুতি। অভিজাত পুরুষরা হাটুর নিচে ধুতি পরলেও সাধারণ পুরুষরা অত্যন্ত খাটো ধুতি পরতেন। নারীরা শাড়ি পরতেন পায়ের কব্জি পর্যন্ত ঝুলের। নারী ও পুরুষেরা উর্ধ্বাঙ্গে অলংকার ছাড়া আর কিছু পরতেন না। উৎসবে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অভিজাত নারীরা কখনো কখনো ওড়না ব্যবহার করতেন। সেন আমলে ধনী মহিলারা বিভিন্ন প্রসাধনী ব্যবহার করতেন। নারীরা কানে কচি তালপাতার মাকড়ি এবং কোমরে সোনার তাগা পরতেন। এই একখণ্ড কাপড় কালের বিবর্তনে বিভিন্ন আকার নিয়েছে। যা একই সাথে লজ্জা নিবারণের পাশাপাশি নান্দনিক বিচারেও হয়েছে অনন্য। পরবর্তীকালে পশ্চিমা দিগন্তের হাওয়া লাগে বাঙালি নারীর অঙ্গে। সেই নবজাগরণ শুরু হয় ঠাকুরবাড়ি থেকে। সামাজিক বিধি নিষেধ আর ঘেরাটোপের বাইরে তারা ঘরের বাইরে এসেছিল। সেই জাগরণে ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরা ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের সাথে সর্বপ্রথম যোগ দিয়েছিল। আর বাইরে বের হবার জন্য ঠাকুরবাড়ির জ্ঞানদানন্দিনী বাঙালি মেয়েদের দিয়েছিলেন রুচিশীল পোশাক ও সাজ। তিনি দেশি ধাঁচের শাড়ীর পরিধান শৈলীর সাথে যোগ করেছিলেন ইউরোপীয় ঢং। বোম্বেতে গিয়ে তিনি জবরজং বাঙালি ধাঁচ বর্জন করে মিষ্টি ছিমছাম ধাঁচকে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের পছন্দ মতো কিছুটা অদল-বদল করে নিয়েছিলেন। পরে বাড়ির সকল মেয়েরা শৈলীটি গ্রহণ করে, এরপর গ্রহণ করে ব্রাহ্মিকারা। বাংলাদেশে এই শৈলীটির নাম হয়েছিল "ঠাকুরবাড়িরশাড়ি" (চিত্রাদেব, ২০১৬, পৃ. ২২)। স্মর্তব্য বাঙালি নারীর পোশাকে বর্তমানে যে শালীনতা নামক শব্দটি যুক্ত হয়েছে তা মূলত, ইংরেজদের দান। নারীর পোশাকের প্রাচীন রীতির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, তারা ছিল স্বল্পবসনা। জ্ঞানদানন্দিনীকে একটা সময়ে

ব্লাউজ না পরার কারণে ইংরেজ ক্লাবে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তবে শাড়ির আধুনিকায়নের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব জ্ঞানদানন্দিনীর নয়। বোম্বাই ঢং-এর যে অসুবিধা, তা দূর করেছিলেন "কুচবিহারের মহারানী কেশব-কন্যা সুনীতি দেবী" (চিত্রাদেব, ২০১৬, পৃ. ২২)। তিনি শাড়ির ঝোলানো অংশ ব্রোচ দিয়ে আটকানোর ব্যবস্থা করেন। তাঁর বোন ময়ূরভঞ্জের মহারানী সুচারু দেবী দিল্লির দরবারে এই আধুনিক ঢংটি নিয়ে আসেন। বাঙালি স্বাচ্ছন্দের সাথে প্রথাটিকে গ্রহণ করেছিল, তবে তারা এক্ষেত্রে জ্ঞানদানন্দিনীর ঢং-এ বাম দিকে আঁচল রাখত। শাড়ির সাথে লেস দেওয়া জ্যাকেট ও ব্লাউজ পরার প্রচলন বাঙালিদের সেই সময় থেকে। তবে সমাজ সেলাই করা এই পোশাকটিকে গ্রহণ করেছিল আরও কিছু সময় পরে। বাঙালি মুসলমানি কায়দার পোশাককে ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা অন্তপুরে ঢুকতে না দিলেও ব্রাহ্মিকাদের পোশাককে ঢুকতে দিয়েছিল। ব্রাহ্মিকারা ব্রিটিশ নারীদের আদলে গাউন পরিধান করত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেমন স্বদেশি পোশাক তৈরি করার জন্য পায়জামাতে কোঁচা আর সোলার টুপির সাথে পাগড়ির মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন, তেমনি ব্রাহ্মিকারা গাউনের সাথে আঁচলের মিশ্রণ ঘটায়। মাথায় আঁচল দেওয়া যেত না বলে তারা ছোট টুপি পরিধান করত।

২. ক

২. খ

২ (ক) গুজরাজি শাড়ি পরার ঢং
২ (খ) আধুনিক শাড়ি পরিধানের ঢং

এই সময়ের আগ পর্যন্ত নারীকে শাড়ি ছাড়া অন্য পোশাকে দেখা যায়নি। তবে বাঙালি মুসলমান মেয়েরা সেলোয়ার-কামিজ ও ওড়না পরিধান করত। সুতরাং বর্তমান যে শালীনতা তা হাজার বছরের বাঙালি মুসলমান কিংবা হিন্দু কারও পোশাকেই পরিলক্ষিত হয়নি। মূলত ইউরোপীয় শিক্ষার সাথে নতুন উপলব্ধি সমাজে পরিবর্তন আনতে সহায়তা করেছিল।

সংস্কৃতিমনা মেয়েদের মধ্যে অসনাতনী রীতির প্রচলন শুরু হলেও তারা পা থেকে বুক অবধি যথেষ্ট ঢেকে রাখত যা এখনও যথেষ্ট জোরালোভাবে সমাজে পরিলক্ষিত হয়, এজন্য সেলোয়ার কামিজের সাথে নাম মাত্র ওড়না পরিধানের রীতিটি অতীত থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কঠোরভাবে মেনে চলার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বর্তমান সময়ে পুরুষ সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় পোশাক ঘরের বাইরে পরিধান করেও নারীরা এক্ষেত্রে ফিউশন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। যেমন কামিজের সাথে বর্তমান মেয়েরা প্যান্ট পরিধান করে, আবার প্যান্ট শার্টের সাথে ছোট স্কার্ফ পড়ে। বাঙালি একসময়ে পরিধান করেছিলো একখণ্ড কাপড়, পরবর্তীকালে তাতে যুগের হাওয়া লাগে। বর্তমান সময়ে যদিও শাড়ি-লুঙ্গির প্রচলন রয়ে গেছে, তবু কালের বিবর্তনে ও আধুনিকতার ছোঁয়ায় তাতে যোগ হচ্ছে নিত্য নতুন ঢং। তবু বলা যায়, এতো কিছুর মাঝেও সেই একখণ্ড কাপড় অর্থাৎ শাড়ি ও কিছুটা পরিবর্তিত হওয়া লুঙ্গি আজও বাঙালির পোশাক।

## পোশাক পরিকল্পনায় ঐতিহ্যবাহী পোশাক

পোশাকের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষগুলো এমন ধরনের পোশাক বেছে নিয়েছিল যা তাদেরকে প্রাত্যহিক জীবনের নানা কর্মকাণ্ডে আরাম দেবে। পরবর্তীকালে এর সাথে যোগ হয়েছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলি। আর্যদের সময় পুরো ভারতবর্ষে গাছের বাকল থেকে তৈরি করা কাপড় ব্যবহারের প্রচলন ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মাধ্যমে জানা গেছে, বঙ্গ দেশে এক সময় কাপড় তৈরি হতো গাছের বাকল থেকে। সেকালের অর্থ অনার্য বা মিশ্র জনগোষ্ঠীর মানুষেরা গাছের বাকলকে পিটিয়ে কাপড়ের মতো পাতলা করে তারপর শুকিয়ে গায়ে দেবার যোগ্য করে তুলত। বাকল থেকে তৈরি কাপড়কে বলা হয় ক্ষৌম। এর মাধ্যমে সেরা জাতের ক্ষৌমকে বলা হতো দুকুল। বঙ্গদেশে পুরুষেরা সে সময় দুকুল পরিধান করত নিম্নাঙ্গে। চাণক্যের অর্থশাস্ত্র থেকে জানা যায় খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ থেকে ৪০০ অব্দ থেকে বঙ্গ এবং মগধে রেশমের চাষ হতো। সে সময় রেশম ছিল অতি মূল্যবান সুতা। অর্থাৎ রেশমের প্রচলন সমাজের উপরের তলাতেই ছিল। ঐতিহাসিক নীহারঞ্জন রায় মনে করেন, আদিমকালে পূর্ব-দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে সেলাই করা কাপড় পরার প্রচলন ছিল না। এই অখণ্ড বস্ত্রটি পুরুষের পরিধানে থাকলে হতো ধুতি আর মেয়েদের পরিধানে থাকে শাড়ি। নারী পুরুষ উভয়ের শরীরের ওপরের অংশ উন্মুক্তই থাকত। যুগের কাল পরিক্রমায় এভাবেই পোশাক ব্যবহৃত হয়ে আসছে, যা যুগের চাহিদাতেই ধারা বদলেছে বারবার।

স্মর্তব্য, থিয়েটার সৃষ্টির শুরুর সময় থেকে থিয়েটারে ক্রিয়া উপস্থাপনের জন্য পোশাককে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এটি দর্শকদের নাটকের চরিত্র, সামাজিক অবস্থান, ব্যক্তিত্ব সৃষ্টিতে অবদান রাখে। অনেক অভিনেতাই মনে করেন পোশাক তাঁর অভিনীত চরিত্রটির বাস্তবভিত্তিক অনুধাবনে দর্শককে প্রভাবিত করবে এবং তার ক্রিয়া সহজে বোধগম্য হবে। অনেক সময় পোশাক ঐতিহ্যগত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে থিয়েটারে উপস্থাপিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ যে চারপাশ থেকে জ্ঞান আহরণ করে সেখান থেকেই শিল্পের সূত্রপাত। পোশাক পরিকল্পনাও পরিকল্পকের ধারণাগত উপলব্ধির ফসল। পিরিয়ড প্লে কিংবা কন্টেম্পরারি, যেই শৈলীতেই নাটক উপস্থাপিত হোক নাটকের জন্য ন্যূনতম কিছু নকশা পোশাক পরিকল্পক করে থাকেন। এককালে থিয়েটার ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম। চিত্রকলা ও নাট্যকলা এই দুয়ের পার্থক্য হলো চিত্রকলা দ্বিমাত্রিক, নাট্যকলা ত্রিমাত্রিক। "কোনো ত্রিমাত্রিক স্থানে এক বা একাধিক দর্শকের সামনে যে ক্রিয়া উপস্থাপন হয় তাকে 'নাট্য' " (সৈয়দ জামিল, ১৯৯৫, পৃ. ১) বলে। যেহেতু নাটক দৈনন্দিন বাস্তবতার গ্রহিষ্ণু ইমেজ তাই এর আত্মায় আছে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা আর সৃষ্টিশীল কল্পনা। ব্রিটিশ প্রকৃতি বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২)-এর *The Origin of the Specie* (Brockett, 1964, p. 261) মতবাদের দুটো প্রধান অংশ ছিল– ১. বিবর্তন অথবা সকল জীবন যে রূপ থেকে বিকশিত হয়েছে। ২. যোগ্যতমের বেঁচে থাকার অধিকার। এখানে মূলত অনেক বিষয়ের মাঝে বিষয়টির ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে তা হলো ঈশ্বরের অস্তিত্ব। " If he existed according to the new views, it was as a totally indifferent and impersonal force " (Brockett ,1964, p. 261)। স্পষ্টতই প্রতীয়মাণ হয় যে, থিয়েটার টিকে থাকার লড়াইয়ে যোগ্যতম। থিয়েটার শিল্পের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। ডিজিটাল প্রযুক্তির এত উৎকর্ষের পরও দর্শক আজও থিয়েটার উপভোগ করতে আগ্রহী। এর প্রধান কারণ হলো থিয়েটার দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে সক্ষম। সামাজিক চিন্তার প্রতিফলন থিয়েটারে পড়ে, ফলে থিয়েটার কখনই জনজীবনের গণ্ডির বাইরে যায় না।

স্পষ্টতই, থিয়েটার প্রচীন যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় অবধি শিল্পকলায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। প্রচীনকালে শিল্প ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা বিধিবদ্ধ ছিল, তৈরি হয়েছিল শিল্পশাস্ত্র। শিল্প বরাবরই উপভোগের ও সুন্দরের সাথে সম্পর্কিত। কিছুকাল আগ অবধি শিল্পের জন্য শিল্প কথাটি বেশ জনপ্রিয় ছিল। ধারণাটির উৎপত্তি ঊনবিংশ শতকে ফ্রান্সে। যদিও 'আর্ট ফর আর্ট' সেক সমস্ত রাজনৈতিক এবং আদর্শিক উদ্বেগ থেকে সরে আসে। হুইসলার শিল্পের

মূল্যের ওপর জোর দিয়েছেন। বোদলেয়ার পূর্বে শিল্পের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী থাকলেও পরবর্তীকালে নিজের পুরোনো বিশ্বাস থেকে সরে এসেছেন। তিনি এসময় ঘোষণা দেন, শিল্পের সামাজিক উদ্দেশ্য থাকতে হবে। অর্থাৎ, শিল্পকে হতে হবে সমাজ নিরপেক্ষ। কারণ শিল্প শুধু জীবনকে নতুন করে সৃষ্টি করে না, এটি জীবনকে ব্যাখ্যাও করে। বলিনস্কি মনে করতেন, জনকল্যাণের উপায় হলো জনচেতনা আর চেতনা উন্নয়নে বিজ্ঞানের চেয়ে শিল্প কম যায় না। টলস্টয় খুব জোরের সাথে শিল্পের জন্য শিল্প তত্ত্বটির বিরোধিতা করেছিলেন। ইবসেন, বার্নাড শ' তাঁরা কেউ তত্ত্বটির সমর্থন করেননি। ফরাসি গণনাট্যের পথিকৃৎ রঁম্য রঁলা সর্বসাধারণের কাছে নাটককে পৌঁছে দিতে তত্ত্বটির সমর্থন করেননি। ইবসেনের নাটকে সমাজ সত্যের প্রতিফলন ছিল বলেই দর্শক তা সাদরে গ্রহণ করেছিল। প্রবন্ধকারের এই পর্যন্ত হাইপোথিসিস উৎপাদনের মূলে আছে, পোশাক তৈরির ঐতিহ্যকে যা আদিকাল থেকে বাঙালি আহরণ করেছে যা বর্তমানে ইকো ফ্যাশন নামে প্রচলিত, তা যদি থিয়েটারের পোশাক পরিকল্পনায় ব্যবহার করা হয় তবে জনচেতনা উন্নয়নে তা সমাজে ভূমিকা রাখতে পারবে কি না, এই শর্ত থেকে। এর সাথে যুক্ত স্থায়িত্বের বিষয়টি। ব্যবসায়িক ও নীতির প্রেক্ষাপটে কাপড়ের দীর্ঘ মেয়াদের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে একইসাথে অর্থের অপচয় রোধ হবে, পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি থিয়েটারের কলাকুশীলবগণ পাবে দীর্ঘদিন ও সময় ব্যবহার উপযোগী পোশাক। গবেষণায় সাসটেইনেবল পোশাকের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যা প্রকৃতিক উৎস থেকে পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা যায়। নিচের চিত্রগুলোতে স্লো ফ্যাশনের একই কাপড়ের বিভিন্ন নান্দনিক ব্যবহারের প্রক্রিয়া দেখানো হলো। এক্ষেত্রে প্রথমে ইকো ফ্রেন্ডলি পোশাকের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ জরুরি। বলা হয়ে থাকে, এই ধরনের পোশাক প্রাকৃতিক উপাদান থেকে তৈরি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে এটি এক ধরনের মূল্যবান দিক নির্দেশনা। এক্ষেত্রে পোশাকের কাঁচামাল যেহেতু প্রকৃতি থেকে আসে তাই এটি একইসাথে নিরাপদ, টেকসই, যদিও সোর্সিংয়ে সময় লাগে। নিশ্চিতভাবে এটি পুনঃব্যবহার যোগ্য, থিয়েটারে এক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয় যে, এর পুনঃব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও স্থায়িত্ব।

> As storytellers, we have a unique capacity to explore key issues with audiences both on and off the stage. In a warming world, this means taking leadership in communicating the importance of environmental action, whether that be through the content of our

projects or the sharing of our practice ( Staging Change, 2019) (Theatre Green Book," n.d. page 13)|

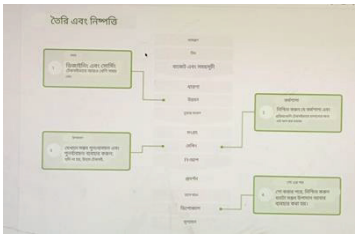


চিত্র : ৩

মুখ্যত বর্তমান পরিবর্তনশীল সমাজে থিয়েটারই কেবল পরিবর্তিত হচ্ছে না বরং থিয়েটাকে পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হতে হচ্ছে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ইকো ফ্রেন্ডলি পোশাককে কেন্দ্র করে থিয়েটারের নব্য বয়ান ইকো থিয়েট্রিক্সকে পোশাক পরিকল্পনার সাথে যুক্ত করতে পারলে দেশের সম্ভাবনাময় শিল্পবিনোদনের খাত উন্মোচিত হবে এবং একইসাথে দেশীয় ঐতিহ্য রক্ষার প্রয়াস চালানো হবে যা একইসাথে চ্যালেঞ্জের, কারণ এটি দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ও ব্যয়বহুল। প্রবন্ধটি দেশীয় ঐতিহ্য রক্ষার পাশাপাশি থিয়েটার শিল্পের নতুন সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। স্মর্তব্য, থিয়েটারে পোশাক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ফ্রেব্রিক্স বা কাপড় একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। অর্থাৎ কোন উপাদান দিয়ে কাপড়টি তৈরি তা যেকোনো থিয়েটার দলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঐতিহ্যগতদিক থেকে এদেশীয় টেক্সটাইলের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। একটা সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে তুলা উৎপাদন করা হতো এবং তা ছড়িয়ে দেওয়া হতো পারস্য, মিশর এবং পরবর্তীকালে ইউরোপে। মসলিন ছিল এই অঞ্চলের সূক্ষ্ম বস্ত্রের একটি। সাধারণত এটি অভিজাত পরিবারের মেয়েরা ব্যবহার করত। এর বিপুল জনপ্রিয়তার মূলত কারণ তিনটি। "the outstanding talent of its weavers; the unique cotton; and the classiness of handspun yarn" (Bibi Fatema n.d.)। ঢাকা মুঘল প্রদেশের রাজধানী হবার পরবর্তীকালে ১৭ শতকের পর থেকে মূলত এটি রাজধানীর আকার ধারণ করতে শুরু করে। ফলে শহরটিতে সরকারি কার্যক্রমের সাথে সাথে কারখানা নির্মাণ এমনকি বস্ত্র ব্যবসায়ীদের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এরপর থেকে মূলত, জামদানি, মসলিনের মতো কাপড়ের তাঁত বুননে তাঁতিরা

আগ্রহী হয়। এরপর একটা সময়ে শিল্পটি বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীনের পর সরকার, এনজিও, ব্যক্তির মিলিত প্রয়াসে জামদানি বর্তমানে বেশ জনপ্রিয় একটি পোশাক। কেবল মেয়েরা নয়, শৌখিন পুরুষও এটি ব্যবহার করে থাকে। যদিও মসলিন একজন তাঁতির দ্বারা তৈরি হতো, কিন্তু জামদানি তৈরিতে দুজন তাঁতির প্রয়োজন। এর তাঁত একদম সরলভাবে কাঠ ও বাঁশ দিয়ে তৈরি।

স্মর্তব্য, ইকো ফ্যাশনের আওতাভুক্ত কাপড়কে যদি স্লো ফ্যাশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে ফাস্ট ফ্যাশন সর্বদাই প্রচলিত ট্রেন্ডকে অনুসরণ করবে। বর্তমান ফ্যাশন ডিজাইনারগণ প্রচলিত এই ধারণার বিপরীতে গিয়ে দেশীয় ঐতিহ্যবাহী পোশাককে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দিয়েছেন। কুটির শিল্পের আওতাভুক্ত নান্দনিক এই ঐতিহ্যবাহী কাপড়টি থিয়েটারের পোশাক পরিকল্পনায় কেনো ব্যবহৃত হয় না তাই বর্তমান অংশে বিচার্য।

- বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে জামদানির মতো ব্যয়বহুল পোশাক, থিয়েটারে পোশাক পরিকল্পনায় পোশাক পরিকল্পকের ; সর্বোপরি জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারবে কিনা ?
- থিয়েটারে কেনো সাসটেইনেবল পোশাক ও ইকো ফ্রেন্ডলি পোশাক পরিকল্পনা জরুরি ?
- ঐতিহ্যগতভাবে জামদানি কীভাবে যোগাযোগ রক্ষায় সহায়তা করবে ?
- অভিনেতা কীভাবে জামদানির সাথে আচরণ করবে? কিংবা জামদানি কতোটা অভিনয় বান্ধব হতে পারবে ?

লক্ষণীয়, যিনি পোশাক পরিকল্পক তিনি পোশাকটি বহন করেন না। অভিনেতাই কেবল এটি দর্শকের সামনে পরিদর্শনের সুযোগ পায়। পরিকল্পক পকিল্পনার মাধ্যমে এনকোড করেন, দর্শক তা ডিকোড করে। এটি যোগাযোগের একটি অবাচনিক প্রক্রিয়া। থিয়েটারের পরিবেশনা নিম্নোক্তভাবে বাস্তবায়িত হয়।

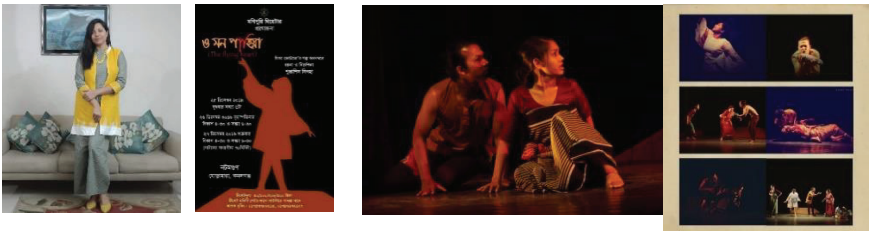

ক খ গ ঘ

চিত্র: ৪ (ক) তে (https://www.facebook.com/rehmuma.hossain?mibextid=hIlR13) ধরা যাক, ফেব্রিকটি পরিকল্পক এনকোড করেছেন। ৬ (খ) তে ও মন পাহিয়া নাটকের নাট্যকার ও নির্দেশক প্রযোজনায় ঐতিহ্যবাহী পোশাকের ডিকোড আকারে প্রয়োগ।

নাটকে পোশাক পরিকল্পনা অভিনয় শিল্পীদের শরীরকে কেন্দ্র করে পরিকল্পনা করা হয়, যাতে দর্শকের সাথে কার্যকর উপায়ে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়। তত্ত্বগত দিক থেকে অবশ্যই এটি প্রতিটি পোশাক পরিকল্পকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পোশাকের মাধ্যমে খুব সহজে ভাবের আদান প্রদান করা সম্ভব। আবার শরীর যে তথ্য দেয় মন তার বিশ্লেষণ করে। এভাবে পোশাক কোড ডিকোডের খেলা খেলে। অবাচনিক যোগাযোগ হচ্ছে দেহের সাহায্যে ভাবের আদান-প্রদান করা। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তিকে দেখার পর কথার বদলে কেবল হাসির বিনিময়ে ভাবের আদান প্রদান। এটি বাচনিক যোগাযোগের ঠিক বিপরীতে অবস্থান করছে। পোশাক অবাচনিক যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। প্রাথমিকভাবে এটি গোষ্ঠীদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ প্রতিটা গোষ্ঠীর পোশাক তাদের সামাজিক নীতি নৈতিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে এই ভাষাগুলোকে একেবারে শব্দহীন বলা যাবে না। কারণ ব্যক্তি বিষয়টি ধারণ করে থাকে ও তার নিজস্ব আবেগের মাধ্যমেই প্রকাশ করে থাকে। পোশাকের মাধ্যমে একজন পরিকল্পককে সমগ্র দেহকেন্দ্রিক চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করতে হয়। অন্তর্গত দিক থেকে পোশাক দেহ ও পোশাকের উপাদান এই দুটো বিষয়ের মোকাবিলা করে। পোশাক যেহেতু সাংস্কৃতিকভাবে বৈচিত্র্যময় তাই পোশাক পরিকল্পকের কাজের ন্যায্যতা আছে। বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশে থিয়েটারে পোশাক বিষয়টি এতো জটিল যে এটি নেভিগেট করা গবেষণার আরেকটি লক্ষ্য। পোশাক মানব জীবনে বিচিত্র ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পোশাকের মাধ্যমেই বহুর মধ্যে এক হয়ে ওঠা যায়। এই রূপান্তর প্রক্রিয়া এক মানুষ থেকে অন্য মানুষে, এক সময় থেকে অন্য সময় পরিক্রমায় পরিকল্পক সম্পাদন করে থাকেন।

পোশাক এক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক কাজটি করে পরিকল্পককে সহায়তা করে। থিয়েটারে এই রূপান্তর প্রক্রিয়া ঘটান একজন পোশাক পরিকল্পক। অবশ্যই পোশাক অন্য ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করার প্রাথমিক অবাচনিক মাধ্যম।

থিয়েটারের ক্ষেত্রে পরিকল্পক সমগ্র কাজটি করে থাকেন ব্যক্তিগত প্রভাব বলয় থেকে বের হয়ে। অবশ্যই একজন দক্ষ পরিকল্পকের প্রথম লক্ষ থাকে পরিকল্পনার যথার্থতা। তিনি লক্ষ রাখেন তার পরিকল্পনা যাতে সহজে বাস্তবায়িত হতে পারে, উপাদানগুলো যাতে সহজলভ্য থাকে ও দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যায়। সর্বোপরি পরিবেশনার জন্য উপযোগী হয়, সেই বিষয়টির প্রতি তাকে সার্বক্ষণিক খেয়াল রাখতে হয়। স্মর্তব্য, এই কারণে পোশাক পরিকল্পনা খুবই প্রতিশ্রুতিশীল বিষয়, যার ওপর অধ্যয়নের প্রয়োজন আছে, অবাচনিক হলেও পোশাক ভাষাবিজ্ঞানের অংশ। প্রবন্ধের বর্তমান অংশে বাইনারি অপজিশন তত্ত্বকে লক্ষ রেখে ইকো ফ্রেন্ডলি পোশাক হিসেবে মণিপুরি কাপড়ের বিষয়টি পর্যলোচনা করা হবে। প্রবন্ধের লক্ষ অনুযায়ী যদি মণিপুরি কাপড়কে পোশাক পরিকল্পনার সাথে সংযোজিত করা হয় তবে প্রথমেই যে বিষয়টির দিকে খেয়াল রাখা জরুরি তা হলো জীবন। এটা অবশ্যই অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখবে। " Everything in a truly sustainable show will have had a previous life. Everything will be used again .That creates a 'circular economy" (Theatre Green Book , n.d. p. 14)। যা যা পুনঃব্যবহারযোগ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয়, পরিবহণ ব্যয় কম তা থিয়েটারের পোশাক পরিকল্পনার অংশ হতে পারে। স্মর্তব্য কার্বন ক্যালকুলেটর ডিজাইনের অংশ হতে পারে, তবে তাতে প্রচুর ডেটার প্রয়োজন এবং পরিকল্পকগণের প্রয়োজন প্রশিক্ষণ। "In the next few years, they must become widespread. Producers can help by gathering information to feed into rigorous evidence-based carbon budgets" (Theatre Green Book , n.d. p. 14)। তবে প্রাথমিকভাবে থিয়েটারে পরিবর্তন আনার জন্য ইকো থিয়েট্রিক্সের নীতিসমূহ অনুধাবন অত্যন্ত জরুরি পরিকল্পকগণের। প্রকল্পটি অনেক ক্ষেত্রেই পরিকল্পকগণের জন্য চ্যালেঞ্জের। কারণ এটি পরিবর্তিত পৃথিবীর জন্য উচ্চাভিলাষী আকাঙ্ক্ষা। তবে এই বাস্তবতা পৃথিবীর অনেক পরিকল্পক গ্রহণ করেছেন। পরিকল্পকগণ সাধারণত সীমাবদ্ধতার মাঝে কম খরচে, স্বীয় গণ্ডির ভেতরে থেকে পরিকল্পনা গ্রগণ করেন। ইকো থিয়েট্রিক্সের সীমাবদ্ধতা ও সৃজনশীলতা সমান্তরালে চ্যালেঞ্জকে গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করে। আবার বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের পরিপ্রেক্ষিতে কম সম্পদকে ব্যবহার করে বেশি করে উদ্ভাবনের দিকে নিয়ে

যাবার দিকে উৎসাহিত করা হয়। সেট ডিজাইনে এখন অবধি টেকসই রীতি উদ্ভাবিত হয়নি। স্থাপত্যের দিক থেকেও এটি কঠিন কাজ। কিন্তু পোশাক অবলীলায় অসীমের এই যাত্রায় নিজেকে সামিল করতে পারে। এক্ষেত্রে সেটের মতো পোশাক পরিকল্পনাতেও মনোযোগ ও ব্যয়ের প্রসার ঘটালে কাজটি সহজতর হবে। মূলত মঞ্চে ব্যবহৃত পোশাক আগে ব্যবহার করা যেত এবং শো এর পরও ব্যবহারের কার্যকারিতা হারাবে না। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এটাই আপাত অর্থে অর্থনীতিতে অবদান। এর সাথে যোগ হবে দর্শকের উৎসাহের ফলে উক্ত কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধি। ফলে প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, জামদানির চেয়ে মণিপুরী শাড়ি অধিক টেকসই ও একের অধিক শোতে পুনঃব্যবহারযোগ্য। কাপড়টির টেক্সচার সুতি হবার ফলে অভিনেতা সহজে দেশীয় আবহাওয়ায় ব্যবহার করতে পারে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় তথ্য হচ্ছে, কাপড়টি নান্দনিকতা হারায় না। রঙের দিক থেকে উজ্জ্বল রং ব্যবহার করা হয়, যাতে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণে বেগ পেতে হয় না।

- যেহেতু পোশাকটি তুলনামূলক কম ব্যয়বহুল, তাই মণিপুরি পোশাকের মাধ্যমে দেশ, কাল, ভূগোল, ইতিহাস অর্থাৎ একটা জাতির / গোত্রের / অঞ্চলের মানুষের গল্পকে তুলে ধরা সম্ভব।
- মণিপুরি কাপড় দ্বারা পরিকল্পিত পোশাক অভিনেতাবৃন্দ খুব সহজে ব্যবহারে সমর্থ্য হয়।

**গবেষণার ফল**

যেহেতু গবেষণাটি নাট্যকলা সংক্রান্ত জ্ঞান উৎপাদনকে ঘিরে, তাই অবশ্যম্ভাবীভাবে ভিক্টর টার্নার (১৯২০-১৯৮৩) ও রিচার্ড শেখনা-এর (১৯৩৪) গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তারা দুজনই দেখিয়েছেন সমাজের প্রতিটি কার্যকলাপ কোড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়ন থেকে তারা দুজনই দেখিয়েছেন পারফরমেন্স কীভাবে মানুষের জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। পারফরমেন্স থিওরি অনুযায়ী সমজের প্রতিটা মানুষ পারফরমেন্সের ভেতর দিয়ে দিন অতিবাহিত করে।

> Whether through the clothes we wear, the conversations we hold or the food we eat, all are a performance designed as a signal– system

> to ourselves and to others of our place within our social group (Goffiman, 1969 , p.28.)

অন্যদিকে জুডিথ বাটলার ও জ্যাক দেরিদাও সমাজে ব্যক্তি পরিচয়কে শক্তিশালীভাবে তুলে ধরতে ও যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে এই দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন।

> signal– system When an individual plays a part he implicitly requests his observes to take seriously the impression that is festered before them . They are asked to believe that the character they see actually possesses the attributes he appears to possess, that the task he performs will have the consequences that are implicitly claimed for it and that in general, matters are what they appear to be. (Goffiman, E 1969 , p. 17)।

প্রকৃতপক্ষে পাফরমেন্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মধ্যযুগে ইউরোপীয় শহরগুলোতে থিয়েটারগুলো সাধারণত ধর্মীয় সীমার বাইরে অবস্থিত ছিল। সর্বযুগেই দেখা যায় একটা গোষ্ঠী থিয়েটারকে নিষিদ্ধ করার প্রয়াসে লিপ্ত থাকে। স্বয়ং দার্শনিক প্লেটো কবিদের নির্বাসনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন আবার তাঁর শিষ্য তাঁর বিপরীতে দাঁড়িয়ে পোয়েটিক্স রচনা করেছিলেন। এভাবেই প্রতি যুগে পারফরমেন্সের ধারণা সমাজে প্রক্রিয়া রাখতে সক্ষম হয়েছে ও সমাজকে পরীক্ষা করার সুযোগ করে দেয়। " This is also made possible by a related area of study which is termed `performativity" ( Butler, 1997, p.8 ) । এটি এমন একটি ডিসকোর্স, যা পাফরমেন্সের আইন প্রণয়নে সহায়তা করে। বাটলার মূলত কাজটি এগিয়ে নিয়ে যেতে শব্দ ও ভাষার ক্ষমতার ওপর জোর দিয়েছে। মানুষের ব্যক্তি জগতে ভাষার রয়েছে প্রচুর দখল। বিষয়টি বিচিত্র মনে হলেও এটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একটি স্টেটমেন্ট, যা কেবল বাটলার নয় বরং ফ্রয়েড ও লাঁকাও স্বীকার করে গেছেন। আর শরীর ও মনের ভাষার মিশ্রণে যে অভিনয় সম্পন্ন হয়, তা পণ্ডিত মহলে সর্বজন স্বীকৃত। যেহেতু থিয়েটারে পোশাক পরিকল্পনা ও পারফরমেন্স একে অন্যের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তাই ইকো ফ্যাশনকে থিয়েটারের সাথে যুক্ত করতে পারলে আদতে থিয়েটার শিল্পের বিকাশ ঘটবে। আধুনিক এই যুগে আধুনিকতা ও সংস্কৃতি আলাদা কোনো বিষয় নয়। আধুনিকতাকে সংস্কৃতি থেকে আলাদা করার প্রয়াস থেকে সমাজ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। থিয়েটারকে আধুনিক জমানার সাথে এগিয়ে যাবার স্বার্থে এই দুইয়ের

সমন্বয় করা কর্তব্য। ঐতিহ্যবাহী পোশাককে মূল থিয়েটারের সাথে সংযুক্ত করার প্রয়াসটি সমাধান করতে পারলে জাতি হিসেবে বাঙালির জন্য গর্বের ও একইসাথে এদেশীয় ঐতিহ্যবাহী পোশাকসমূহ সমগ্র বিশ্বের দরবারে স্বল্প সময়ের মধ্যে চাহিদা সৃষ্টিতে সক্ষম হবে। কারণ এদেশীয় পোশাকের ফেব্রিক্স মূলত সুতি তন্তুর দ্বারা বয়ন করা হয় ; যা বৈশ্বিক উষ্ণতার ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বে আলাদা চাহিদা তৈরিতে সক্ষম হবে। আর চাহিদার সাথে যুক্ত আছে যোগান শব্দটি। চাহিদার যোগান দিতে নির্দ্বিধায় প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ; যা দেশীয় অর্থনীতিতে সরাসরি প্রভাব ফেলতে সক্ষম। এদিক থেকে বলা যায়, শিল্প কেবল বিনোদন দেয় না, বাস্তবিকতার বিচারে দেশের হয়ে কাজ করতেও শিল্প সক্ষম। যে চাহিদাটি ফ্যাশন ডিজাইনারগণের জন্য সময় সাপেক্ষ বিষয়, থিয়েটারে একইসাথে অনেক দর্শকের একত্র সরাসরি অংশগ্রহণ চাহিদা তৈরির বিষয়ে তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থানে বিরাজমান। ফলাফলক্রমে, দীর্ঘকাল অবধি শিল্পের এই প্রচীন মাধ্যমটির সাথে বাঙালির ঐতিহ্যবাহী পোশাক বেঁচে থাকবে, দেশ পাবে সমৃদ্ধ অর্থনীতি ও সম্মান।

**উপসংহার**

বাস্তবের প্রতিরূপায়ণ যখন হুবহু সাহিত্যে তুলে ধরা হয় তখন সেটি হয়ে পড়ে সীমাবদ্ধ। বাস্তব প্রকৃতপক্ষে জটিল, বহুস্তরায়িত ও অনিঃশেষিত-ক্রমাগত নির্মীয়মাণ। আর বাস্তবের গ্রন্থিক প্রতিরূপায়ণ-এর আকৃতিগত সীমাবদ্ধতা, এমন এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থিয়েটারে বাঙালির পোশাক। কারণ থিয়েটার একইসাথে আজকের এবং ভাবীকালের। সত্য থেকে জ্ঞান গ্রহণ করে ভবিতব্যের দুয়ারে সফলভাবে পৌঁছে দিতে নাট্যকার পরিকল্পকগণ সফল হলে ভাবীকাল তা গ্রহণ করবেই। দেশীয় উপাদান ভিত্তিক কাপড় পরিকল্পকের পরিকল্পনায় কতোটা সমৃদ্ধ হতে পারে তা কিছুটা হলেও দেশীয় উদ্যোক্তা ও ফ্যাশন ডিজাইনারগণের নান্দনিক পরিকল্পনায় কতোটা এগিয়ে যেতে পারে তা জিআই পণ্য হিসেবে জামদানির স্বীকৃতি দেখলেই প্রতীয়মান হয়। শিল্প সমুদ্রে অবগাহনের প্রচেষ্টা সব শিল্পীর থাকে। এর মাধ্যমে সে তার ভাবনা ও অনুভূতি দর্শকের কাছে পৌঁছে দেন। যখন কোনো শিল্পী দিন রাত এক করে সৃষ্টির পেছনে সময় নিয়োগ করে তাকে তখন বলা হয় তাঁর সামর্থ্যের যোগফল। তিনি অবশ্যই তার কর্ম দর্শকের সামনে উপস্থাপনের পর দর্শকের কাছে সেই রূপ মনোযোগ দাবি করেন– যতটা শ্রম তিনি তাঁর কাজে ব্যয় করেছেন ঠিক ততোটা। নিশ্চই কোনো দর্শক গুরুত্বহীন কোনো বিষয়ে তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করবে না। আবার সব কিছুর পর শিল্পীর নিজস্ব কিছু পছন্দ কিংবা

অপছন্দ থাকে। তিনি চলমান বৈরাগ্যধর্মিতা, নৈরাশ্য বা আশাবাদের খেলায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নিজস্ব পছন্দকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অথবা পৃথিবীর দিকে একেবারেই ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকান অথবা তাঁর পূর্বসূরি শিল্পীগণ যা সৃষ্টি করেছেন সেদিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেন, তা পুনঃসৃষ্টির চেষ্টা চালান । তাঁর অনুভূতি প্রকাশের অবয়বটি কখনও হতে পারে সুস্পষ্ট আবার কখনও বা অস্পষ্ট। শিল্পী তাঁর শৈল্পিক প্রকাশ মাধ্যমকে অবলম্বন করে তাঁর অনুভূতি দর্শকের কাছে পৌঁছে দেন। যেকোনো দেশের শিল্পী সেই দেশের চেতনাকে ধারণ করে থাকেন, শিল্পী হিসেবে সমাজে তাঁর রয়েছে গুরু দায়িত্ব। এদিক থেকে বলা যায়, দেশীয় চেতনা রক্ষায় ঐতিহ্যবাহী পোশাক নিয়ে কাজ করা শিল্পীর নৈতিক দায়িত্ব। শিল্প ভাবাবেগের আঁকশি নয়, এর সাথে যুক্ত থাকে বাস্তবিকতা। বাস্তবিকতার দায় শিল্পী এড়াতে পারেন না। আর তাই পোশাকের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে থিয়েটারের শিল্পীগণ কাজ করলে এর রয়েছে অসীম গুরুত্ব ও সম্ভাবনা।

**সহায়কপঞ্জি**

চিত্রাদেব। (২০১৬)। *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল*। আনন্দ, কলকাতা।

বাংলাদেশের ইতিহাস। onushilon.org. Retrived , October 26, 2023, at 8.35 PM, https:// onushilon.org>rece> negrito

শরবিন্দু, ভট্টাচার্য। (২০২২)। *বাঙালির নৃতত্ত্ব ও হিন্দু সভ্যতা*। রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা।

সফিকুন্নবী সামাদী, সাইফুজ্জামান, মোঃ গাজী ও মেহেদী, মোঃ হাসান। (২০১৭)। *সাহিত্য গবেষণা বিষয় ও কৌশল*। সাহিত্য ভবন, ঢাকা।

হাসনাত আবদুল হাই [সম্পা.] (২০১২)। *সাঈদ আহমদ রচনাবলি*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

A Study on the Traditional Art of Jamdani Weaving: A Representation of Intangible Bangladeshi Cultural Heritage Bibi Fatema University of Dhaka See discussions, stats, and author profiles for this publicationat:https://www.researchgate.net/publication/367190648 .

Brockett , Oscar G . (1964). *The Theatre an Introduction*. 5th ed. India University, United States of America.

Butler, J. (1997). *Excitable Speech : the politics eof the performative*. New York, London. Rutledge.

Goffiman, E (1969). *The presentation of the self in everyday life*. Philadelphia. Pennsylvania University Press.

The Elements of Color, A Treatise on the color system of Johannes ITTEN Based on his Book The Art Of color . Edited And With a Foreword And EVALUATION BY FABER BIRREN> Translated By ERNST VAN HAGEN . VAN NOSTRAND REINHOLD COMPANY< New York, Cincinnati Toronto London Melbourne

Theatre Green Book. (n.d.). Retrieved [current date], from https://theatregreenbook.com/